পথভোলা পথিকেরা

মনিরুল ইসলাম

পথভোলা পথিকেরা
মনিরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৩০০ টাকা

Pothbhola Pothikera by Monirul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Published: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 300 Taka RS: 300 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97557-7-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ সদস্য
ও
সন্ত্রাসবাদের শিকার সকল দেশি-বিদেশি নিরীহ মানুষ

এক

ফেব্রুয়ারি মাসের এই সময়ে কুয়াশার কথা কে কবে শুনেছে! জান অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার কথা ফাল্গুনের ভ্যাপসা গরমে। গত কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়া খুব এলোমেলো। দিনে-রাতে সবসময় গরম। আর ভোরে কুয়াশার চাদর। সুবহে সাদিকও ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। আবহাওয়াবিদরা নাকি বলছেন, উষ্ণ হাওয়া আর ভোরের শীতল হাওয়ার মিথস্ক্রিয়াতেই এই কুয়াশা।

আবু মুস্তাকিম এসব পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের কথা একদম বিশ্বাস করে না। সে মনে করে পশ্চিমাদের অনাচারের কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে। 'শালার ব্যাটারা নিজেদের পাপ ঢাকতে এখন নানা দিকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে', বলে মনে মনে বিড়বিড় করে আবু মুস্তাকিম। ফজরের সালাত আদায়ের পর কিছুক্ষণ ইন্টারনেটে ছিল সে। ফুরফুরা মেজাজে ঘণ্টাখানেক এটা-সেটা সার্ফ করেছে। বছর খানেক আগে গড়া সংগঠনকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি তৈরির কাজ তার শেষ। এখন শুধু একটি একটি করে ধাপ পেরিয়ে মনজিলে পৌঁছানো বাকি।

সামনের দিনের পরিকল্পনার একটি ম্যাপ সে তৈরি করছে মনে মনে। আবু মুস্তাকিমের একটি বড় গুণ হচ্ছে যেকোনো ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সে মানসিকভাবে বড় ধরনের প্রস্তুতি নেয় দীর্ঘকাল ধরে। যতোটুকু পারে তথ্য জোগাড় করে, তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মধ্যেই থাকে। এক্ষেত্রে নিজের ডান বা বাম হাতকেও সে বিশ্বাস করে না। আবার এ মনোভাবও কখনোই তার আচরণের মধ্যে ফুটে ওঠে না। আর এ কারণেই সে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে, গড়ে তুলেছে এই বাংলার সবচেয়ে

বিধ্বংসী ইমানি নেটওয়ার্ক, যা মুহূর্তেই সরকারকে কাঁপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এ কথা ভেবে আত্মতৃপ্তি পায় আবু মুস্তাকিম। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানায়। তবে তার মেজাজ ফুরফুরা থাকার কারণ নিজের ক্ষমতাশালী নেটওয়ার্ক নয়। বরং মেঝেতে পাতা বিছানায় যে শুয়ে আছে তার কারণে। খুব ভালো একটা সময় সে কাটিয়েছে গতরাতে। মুস্তাকিম আড়চোখে ঘুমন্ত সঙ্গীর দিকে তাকায়। পরিতৃপ্তি পায় রাতের কথা ভেবে, মনে মনে আওড়ায়—এমন গভীর তৃপ্তি অনেকদিন পাইনি আমি। নিজেকে বিজয়ী মনে হয় তার। ভেতরে আবারও শয়তান জেগে ওঠে, কষ্টে নিজেকে দমন করে।

মানুষ রোদ, বৃষ্টি, তুষারপাত ভালোবাসে—আবু মুস্তাকিম ভালোবাসে কুয়াশা। ধোঁয়াশা-কুয়াশার ভেতর সে দেখে দুই দিনের এই দুনিয়ায় সৃষ্টির রহস্যময়তা। রাতটা ভালো গেলে তার মাথা দ্রুত কাজ করে। মুস্তাকিমের মাথাতেও কুয়াশা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা থেকেই কঠিন পরিকল্পনাটি চলে এলো। বিশেষ করে যখন সে জানালা দিয়ে কুয়াশার চাদর ভেদ করে—একটি অটোরিকশার আলো দেখতে পেল দূরের রাস্তায়। উত্তরবঙ্গের এই মফস্বল শহরের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার হেডলাইটের আলোকে তার হঠাৎই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত নূরের আলো বলে মনে হলো। তার কম্পিউটারের ডেস্কের পেছনেই জানালা। সে জানালা গলে আলোটা এক ঝলক আবু মুস্তাকিমের গায়েও এসে পড়লো।

পরবর্তী জাহানের পাথেয় সংগ্রহ করতে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে অল্প কিছু সময় দিয়েছেন হাতে। সে সময়ের মধ্যে অনেকটাই নানা বেফিজুল কাজে নষ্ট করে ফেলেছে মুস্তাকিম। বাইরে থেকে মনে হয় বাংলাদেশ জিহাদের জন্য খুব উর্বর দেশ, যেখানে তার স্বপ্নকে মনজিলে মকসুদে পৌঁছানোর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত। আদতে ব্যাপারটা তা নয়। ২০১৪ সালে সে যখন সিরিয়া থেকে দুবাই হয়ে বাংলাদেশে আসে তখন তার কাছেও ব্যাপারটা এমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু এখানে আসার পর দেখা গেল, নব্বই দশক থেকে যে দলগুলো সশস্ত্র জিহাদের ডাক দিয়ে আসছে, তারা বহু ধারায় বিভক্ত। এদের আকিদা ও মানহাজ কোনো কিছুরই ঠিক নাই।

এখন কুয়াশার চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে হবে পুরো জনপদ। তারপর সূর্যের আগমন হলে, সবাই স্বস্তি পাবে—প্রশংসায় মেতে উঠবে মহান আল্লাহর। সূর্যের নিত্য আলোর মতো নিছক উত্তাপ ছড়ানো রোদ হবে না সেটি। বরং হবে নূরের আলো, নূর-এ-শামস।

আর মহান আল্লাহ চাহেন তো সেই নূর-এ-শামসের উৎস হবে খোদ আবু মুস্তাকিম। তখন তার নিজের পুরনো নাম 'রামিম হোসেন'ও তার সাথে আর থাকবে না। আবু মুস্তাকিম আল হানাফি নামেই পরিচিত হবে সে। পুরনো নামটা মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবন থেকে মুছে যাবে বহুকিছু। সে পরিণত হবে সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষে। এই নামটি অবশ্য এক ধরনের উপাধিও। সে নিজেই বাছাই করেছে। কেননা, আগে তার সংগঠনের অনুসারীরা সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক নেতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতো 'ওয়াসিম আজওয়াত' টাইটেল।

বছর খানেক আগে যখন আবু মুস্তাকিম সংগঠন গোছানোর দায়িত্ব নেয় তখন পুরনোরা তাকে আগের টাইটেলটাই ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিল। নিজের টাইটেল হিসেবে 'ওয়াসিম আজওয়াত' শব্দযুগল আবু মুস্তাকিমের পছন্দ হয়নি। 'ওয়াসিম আজওয়াত' অর্থ বাংলায় দাঁড়ায়—অতি উত্তম সৌন্দর্য। কেমন যেন জেনানাদের মতো নাম। তাই সে নিজেই টাইটেল পরিবর্তন করে 'আবু মুস্তাকিম আল হানাফি' রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য শুরুতেই সে সরাসরি টাইটেল বদলানোর কথা বলেনি। কেননা, বছর খানেক আগে যখন সে সংগঠনের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছিলো—তখন সে ছিল সম্পূর্ণ বহিরাগত, সদ্য বিদেশ থেকে আসা মুহাজির মাত্র, যে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কানাডায় ছিল এই ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে তাকে তখন খুব সহজেই সিআইএ বা ইহুদি-নাসারাদের চর বানিয়ে দিতে পারতো সে সময়ের শরিয়াপন্থি নেতারা। আর তার সাথে যোগদানকারীরা ছিল—বাংলাদেশে বহু আগে থেকেই সংগঠন চালিয়ে আসা ঘাগু সব মাল। যাদের মূল সমস্যা হলো—মানহাজ বা কর্মকৌশল ছাড়াই জিহাদের নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা। সবাই নিজেকে প্রধান ও একমাত্র নেতা মনে করতো। ছোট ছোট ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেই দলে ভাঙন। এমনকি মতের ও স্বার্থের মিল না হওয়ায়, এরা নিজেদের মধ্যে ফিৎনা-ফ্যাসাদ করে খুন-খারাবিও করেছে।

এসব বিবেচনায় আবু মুস্তাকিম কৌশলে সংগঠনের প্রথম শুরার বৈঠকে বলেছিল—'ওয়াসিম আজওয়াত' টাইটেলটি তার পছন্দ নয়, কেমন যেন মেয়েলি। বরং 'আবু মুস্তাকিম আল হানাফি' নামটির মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্য আছে। মুস্তাকিম শব্দের অর্থ সোজা, সরল পথ। সে তো সোজা বা সরল পথের মানুষেরই নেতা। শরিয়া একটি সোজা-সরল আইনি ব্যবস্থা।

ওই শুরা বৈঠকে সে তার সুন্দর বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে বলে, দেখুন

'আবু আজওয়াত' টাইটেলটা তো গোয়েন্দারাও জেনে গেছে। কাজেই, এটি পরিবর্তন করতেই হবে। সংগঠনের স্বার্থে। সবাই সেদিন আবু মুস্তাকিমের কথা মেনে নিয়েছিল। তবে, টাইটেল কী হবে সেটি নিয়ে আবু মুস্তাকিমের আসলে থোড়াই কেয়ার ছিল। সে মূলত চাচ্ছিল, টাইটেলের মতো সাধারণ একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করে, নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে দলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এগিয়ে থাকার একটি প্রক্রিয়া শুরু করতে। কেননা, এসব সংগঠনে নেতৃত্ব দিতে হলে—খুব ছোট ছোট বিষয়ে চমক দেখিয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। একসময়ে যখন ছোট এবং ফালতু বিষয়গুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়—তখন বড় বড় তাত্ত্বিক বিষয় এবং সিদ্ধান্তগুলোতেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

বছর খানেক আগে বাংলাদেশের একটি পুরনো শরিয়াভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর একটি উগ্রবাদী দলের বড় একটি গ্রুপ আবু মুস্তাকিমের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছায়। তারা তখন অর্থ ও নেতৃত্ব সংকটে ভুগছিল। দলের পুরনোরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একের পর এক অভিযানে পর্যুদস্ত। নেতাদের কেউ কারাগারে, কেউ কেউ আবার ঝুলে গেছে ফাঁসির দড়িতে। এমনকি পুলিশের ওপর আক্রমণ করে, ক্রসফায়ারেও মারা গেছে কেউ কেউ। সেসব কথা ভাবতে ভাবতেই আবার বর্তমানে ফেরত আসে আবু মুস্তাকিম। কেননা, তার মোবাইলে মেসেজ এসেছে। সাধারণত মোবাইলে মেসেজের জন্য এনক্রিপ্টেড বিভিন্ন অ্যাপ তারা ব্যবহার করে। এখন যে অ্যাপটি সে ব্যবহার করছে—সেটির নাম প্রটেক্টেডটেক্সট। সবদিক থেকেই খুব নিরাপদ। তারপরও সাবধানের মার নেই।

মেসেজে আজকের বৈঠকের সময়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। মেসেজ দেখে দেরি করে না, সঙ্গীকে দ্রুত জাগায়। বলে, আজকের দিনটা অন্য কোথাও থাকো। কেননা, শুরা বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয়েছে সকাল ১১টা।

কুয়াশার ভেতর থেকে আলো দেখে তার মনে যে কল্পনা ধরা দিয়েছিল—সেটিই এবার সে প্রেজেন্টেশন আকারে তৈরি করতে শুরু করে। একটি বিষয় তাকে সব সময় মাথায় রাখতে হয়, যেসব শরিয়াপন্থি নেতাদের সাথে সে কাজ করে—বিশেষ করে লোকবল দিয়ে যারা তাকে সাহায্য করে—এদের একটি বড় অংশ অসম্ভব একগুঁয়ে। এদের নিয়ে একটি বড় সুবিধা হলো একবার বোঝাতে পারলে তাদের দিয়ে যা খুশি করানো যায়, আর অসুবিধা হলো—খুব তুচ্ছ বিষয়ও এত বিশদভাবে

বারবার বলা লাগে যে, ক্লান্তি চলে আসে। আবার কোনো কোনো সময় এদের অহেতুক ঘাউরামিও সহ্য করতে হয়।

আবু মুস্তাকিম প্রেজেন্টেশনের জন্য নতুন স্লাইড খোলে। তারপর হঠাৎই সঙ্গীর দিকে তাকায়। সে তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। এবার তাকে জোর করে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। বলে—সে ইশারা না দিলে যেন আর এমুখো না হয়। হাতে একটি পাঁচশ টাকার নোট ধরিয়ে দিলে বিছানা-চাদর-ঘর পরিষ্কার করে মুস্তাকিমের রাতের সঙ্গীও বেরিয়ে যায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই। তার চলে যাওয়া দেখে আবু মুস্তাকিমের মনে হয়—বিপদ এড়াতে তার নিজের নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মেটানোর দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

গাইবান্ধার সাঘাটার এ বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে অল্প কয়েকদিনের জন্য। চূড়ান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে আরও বেশ কয়েক জায়গায় তাকে ছোটাছুটি করতে হবে। প্রকৃত মুসাফিরের জীবন বলতে যা বোঝায় আরকি! তার মনে পড়ে যায় ঢাকায় যখন জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম এসেছিল—তখন আজিমপুর-নীলক্ষেত এলাকায় সস্তায় থেকেছে বেশ কিছুদিন, এক পরিবারের সাবলেট হিসেবে। তার কাছে কখনোই অর্থের অভাব ছিল না। এখনও যে আছে তা নয়। বিদেশি ডোনার আছে, শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাও তো কম না। কিন্তু সে আসলে চেয়েছিল কাছ থেকে তরুণ প্রজন্মকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে, যাদের নিয়ে সামনের দিনে আল্লাহ চাহে তো, সে এই দেশ চালাবে।

১১টার বৈঠক সাড়ে ১২টায়ও শুরু হয় না। এই দেরির ঘটনায় প্রতিবারই আবু মুস্তাকিম অত্যন্ত বিরক্ত হয়। হাফেজ আবু দুজানা একটি সমস্যা। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে লোকটা, সবসময় সব ধরনের বৈঠকে সবার পরে আসে। আর বরাবরের মতো সবার আগেই আসে আবু মুরসালিন। ছেলেটা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছে। দুর্দান্ত সাহসী। আবার প্রয়োজনে নিষ্ঠুরও হতে পারে। কথা বোঝে লাইন টু লাইন। মিস-ইন্টারপ্রিটেশন করে না। বরং কোনো কিছু না বুঝলে গুছিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করে নেয়।

বৈঠকে আসে ক্যাপ্টেন মফিজ। এছাড়াও আসে গোবিন্দ কুমার, চকলেট মুস্তাফিজ ও সাদ বিন আলি ওয়াক্কাস। এর মধ্যে গোবিন্দ কুমারের ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। সে নিজেকে পুলিশের হাত থেকে লুকিয়ে ফেলেছে শুধু একটা হিন্দু নাম নিয়েই। আগে এই লোক ছিল বাংলাদেশের একটি

শক্তিশালী জিহাদি সংগঠনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক নেতার মেসেঞ্জার। যদিও প্রথম জীবনে সে ছিল খাবারের রেস্তোরাঁর বাবুর্চি কাম ডেলিভারি বয়। ফুড ডেলিভারির পাশাপাশি নিজের সাইকেলে করে বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি নেতার বার্তা পৌঁছে দিত। ওই জঙ্গি নেতা যখন ধরা পড়ে তখন জিজ্ঞাসাবাদে নিজের অনেক পুরনো গুরুত্বপূর্ণ সাথীর পরিচয় ফাঁস করলেও গোবিন্দের নামটি বলেনি। নেতার বার্তাবাহক হওয়ায় গোবিন্দ পরিচিত ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে—যারা শরিয়া কায়েমে বিশ্বাসী।

এদেশে শরিয়াপন্থি দলগুলোর মেরুদণ্ড একের পর এক পুলিশি অভিযানে অনেকটাই ভেঙে গেছে। পুরনো নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আবু দুজানা এখনও কীভাবে কীভাবে যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে। আর এ কারণেই নিজের ছদ্মনাম হিসেবে সে বেছে নিয়েছে আবু দুজানা, যেটি মূলত আরব সাগরের তীরবর্তী সিন্ধু অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ হলেও অরিজিন আরবিতে। অর্থ 'বিজয়ী'। নেতা হিসেবে দলে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়োজন রয়েছে। নানা কারণে আবু দুজানার সাথে কড়া হতে পারে না আবু মুস্তাকিম। তাছাড়া সে এখনও একচ্ছত্র নেতা হিসেবে নিজের নাম সরাসরি ঘোষণা করেনি। কাজেই সংগঠনের সব সদস্যদের সামনে আবু দুজানাকে তার পাত্তা দিতে হয়। কেননা, এই লোকের সাথে দেশের জিহাদকামীদের একটি বড় অংশের যোগাযোগ আছে। বাংলার রাজনীতি-সমাজ-ইতিহাস নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করলেও, নিজে কিন্তু সে এ অঞ্চলটা বিশেষ চেনে না। সে কারণেই যেকোনো জায়গায় যাওয়ার আগে একটা বিস্তর পড়াশোনা তাকে করে নিতে হয়। এই যেমন গাইবান্ধা আসার আগেই সে পড়েছে এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে। তবে মাঠের অভিজ্ঞতা না থাকলে কোনোভাবেই সে ঘাটতি পূরণ হয় না। এটা মুস্তাকিম সবসময় মাথায় রাখে।

আজকের পরিকল্পনার স্লাইডগুলোও আবু মুস্তাকিম তৈরি করেছে নিজের পুঁথিলব্ধ জ্ঞান থেকেই। সে যাদের নিয়ে কাজ করে তাদের একটি বড় অংশই দলের কর্মসূচি যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেওয়া যায় তাতেই আশ্চর্য হয়ে যায়। মুস্তাকিমের তৈরি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে তো আবার ভিডিও-ছবি এমনকি ম্যাপও থাকে। বিশেষ করে যেকোনো প্রেজেন্টেশন সে শুরু করতে চায় ভিডিও দিয়ে। তার মতে, এতে আইসব্রেকিংটা বিনা বাক্যব্যয়ে হয়ে যায়।

যেমন আবু মুস্তাকিম সদর উপজেলার ঘাগোয়া ইউনিয়নের মীরের বাগানের তিন গম্বুজবিশিষ্ট ঐতিহাসিক মসজিদের ভিডিও করে নিয়ে

এসেছে। প্রাচীন ও পরিত্যক্ত এ মসজিদটিকে খুঁজে সংস্কার করা হয়েছিল ১৩০৮ সালে। এ অঞ্চলে ইসলাম কায়েমে মসজিদটির একটা বড় ভূমিকা আছে। আর সেই কারণের নাম শাহ সুলতান জিহাদি। এলাকার মানুষ তো মসজিদটিকে এখন শাহ সুলতান জিহাদির মসজিদ বলেই চেনে। যদিও মসজিদে সালাত আদায়ের ব্যাপারে আবু মুস্তাকিমরা একটু সাবধানতা অবলম্বন করে। নিরাপত্তা ও কৌশলের জন্য তারা আরও অনেক কিছুতেই এমন সাবধানতা দেখায়। যেমন ধরা যাক—আতর ব্যবহার না করে প্রথাগত ওয়েস্টার্ন পারফিউম ব্যবহার করা, দাড়ি না রাখা, সালাম না দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক পোশাকে মসজিদে গিয়ে ভিডিও করলে তো কেউ টের পাবে না তাই না!

আজকের বৈঠকটি মূলত রাজশাহীতে হয়ে যাওয়া আগের একটি বৈঠকের ফলোআপ। গত বছরের মে মাসে তারা একত্রিত হয়ে ঠিক করেছিল এমন একটি জিহাদি গ্রুপ গড়ে তোলা হবে যারা পুরো বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা করে যাবে। এই হামলাগুলোর মধ্য দিয়ে বেশ কিছু লক্ষ্য অর্জন করবে বলে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। প্রথমটি হলো, নিজেদের উপস্থিতির জানান দেওয়া কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে পরিচিতি ফাঁস না হওয়া। দ্বিতীয়ত, বড় হামলার প্রস্তুতির জন্য হাত পাকানো এবং আন্তর্জাতিকভাবে নতুন সংগঠনের নামটিকে পরিচিত করা এবং ডেসপারেট কিছু করার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের রোমান্টিক তরুণদের আকর্ষণ করা।

সাড়ে ১২টায় শুরু হলো শুরার বৈঠক। আবু মুস্তাকিম অবশ্য দেরিতে শুরুর বিষয়ে বৈঠকে একটি বাক্যও ব্যয় করে না। যেন সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সরাসরি সালাম দিয়েই শুরু করে ভিডিও দেখানো। শেষ হলে বলে, "দেখুন, আজ থেকে প্রায় সাতশ বছর আগে এখানে একজন জিহাদি ছিলেন। তার নামেই এখানে মসজিদ হয়েছে। এটা একটা ইশারা। আমরা নতুন করে শুরু করবো এখান থেকে।"

রাতের মধুর স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত আবু মুস্তাকিমের মনে যে পরিকল্পনা এসেছিল, সেটি সে শুরার বৈঠকে খুলে বলে। সে বলে, "বিচ্ছিন্নভাবে আমরা অনেকদিন চেষ্টা করেছি। এটি জারি থাকবে। কিন্তু দেশের তাগুত বাহিনীকে যে ছবক আমরা বড় আকারে দিতে চাই তার সময় হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের পরিকল্পনা অন্যভাবে সাজাতে হবে। আমরা যখন জিহাদের কৌশল সাজাবো তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম কীভাবে সেই কৌশল সাজাতেন।

তিনি শরিয়া কায়েমের জন্য সীমিত শক্তি নিয়েও সরাসরি কাফিরদের মুখোমুখি হয়েছেন। সাহাবীরা শহিদ হতে ছিলেন সবসময় প্রস্তুত। এখন সময় এসেছে, কাফিরদের-ইহুদি-নাসারাদের সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা শিক্ষা দেওয়ার। আর তাই হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণের পাশে আরেক ধরনের হামলা আমাদের চালাতে হবে। আর এর মধ্য দিয়েই শুরু হবে 'গাজওয়াতুল হিন্দ'-এর সেই পবিত্র অধ্যায়।"

আবু মুস্তাকিম আরও বলে, "ইতোমধ্যে আমরা বলেছি যে নতুন এই হামলায় হামলাকারীদের সবাই শহিদ হবে এবং সে কারণেই আমরা শুরার সদস্যরা নিজেরা কেউ সরাসরি হামলায় জড়িত হতে পারবো না। কাজেই আমাদের তরুণদের কাজে লাগাতে হবে। যাদের অনেকেই হাত পাকিয়েছে এবং মহান আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে শহিদ করতে ইচ্ছুক।"

আবু মুস্তাকিমের বক্তব্য অনেকক্ষণ চলে। সে ইচ্ছা করেই জোহরের আজানেরও অনেক পর পর্যন্ত বক্তব্য প্রলম্বিত করে, যাতে আবু দুজানা তেমন কিছু বলার সুযোগ না পায়।

আবু মুস্তাকিম কথা বলার সময় বাংলা-ইংরেজি-আরবি মিশিয়ে বলে। ফলে তার কথার ভার অনেক বেড়ে যায়। কখনো কখনো খাস লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে। এতে আন্তরিকতা বাড়ে। তার বিদেশি টোনে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাকিদের মধ্যে অনাবিল আনন্দ দেয়।

বক্তব্যের শেষে আবু মুস্তাকিম হাসতে হাসতে বলে, "আইসো বাহে বৈদত যাই।"

বর্ষায় প্রতিদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথেই গাইবান্ধার এই আঞ্চলিক বাক্যটিতে মুখরিত হয়ে উঠে পল্লিগ্রাম। পেশা ও নেশাদার মাছ শিকারি নেতারা দরাজ গলায় মাছ শিকারের জন্য উৎসাহীদের এভাবেই ডাকে। সাড়া দিয়ে শিকারিদল জড়ো হয়। তারা মাথায় গামছা, পলিথিনে মোড়ানো বিড়ি-ম্যাচ কোমরে বেঁধে আর ঘাড়ে পলো নিয়ে ছুটতে থাকে মাছ ধরতে। মাছ শিকারিরা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে খাল-বিলের কাছে পৌঁছায়। তারপর গলা পানিতে নেমে শুরু করে মাছ ধরার মহোৎসব। যদিও মুস্তাকিম ও তার দলের কাছে এই নির্দোষ আঞ্চলিক প্রবচনের অর্থ মাছ ধরার মহোৎসব নয়, বরং 'তাগুত' শিকারের মহোৎসব।

আবু মুস্তাকিমের আঞ্চলিক ভাষা শুনে বৈঠকে উপস্থিত বাকি ছয়জনই হেসে ফেলে। জোহরের নামাজ পড়ে তারা বের হয়ে যায়। দুপুরে খাওয়ার তোয়াক্কা করে না।

দুই

আবু দুজানা অসম্ভব স্মরণশক্তির অধিকারী। মাত্র ৮ বছর বয়সে কোরানে হাফেজ হয়েছে। তার একটাই সমস্যা উচ্চারণে। ইদানীং সহীহ আরবি শিক্ষার নামে বেশ কিছু স্মার্ট কোরানে হাফেজ তৈরি হয়েছে। তাদেরকে সে মনেপ্রাণে একটু হিংসাই করে। এদের কেউ কেউ আবার তর্জমাটাও ভালো বোঝে। উচ্চারণ ভালো না হওয়ায়, পরিশুদ্ধ বাক্য বলতে না পারায় আবু দুজানা দীর্ঘদিন আন্ডাররেটেড ছিল। কিন্তু তার অসামান্য স্মৃতিশক্তির কারণে শরিয়া কায়েমের মুজাহিদদের চেহারা সে মনে রাখতে পারতো—নাম, ঠিকানাসহ। তার মনে পড়ে, একের পর এক বোমা হামলার কারণে তাদের সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা যখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুললো কিংবা জেলে গেল তখন সে কীভাবে বেঁচে গিয়েছিল! ২০০৪ সাল থেকে প্রায় এক দশক বাংলা অঞ্চলে সে-ই তো হাল ধরে রেখেছে সংগঠনের।

মাঝে কিছুদিন জেল থেকেই শায়খ কবিরুল দলের ভার পরিচালনা করছিল। তার হুকুম শুনে মনে হতো, তাগুত বাহিনীর কথামতোই সে এইসব বিশেষ হুকুম দিচ্ছে। তাই পুরনো সাথী ডাক্তার মাজহারুলকে নিয়ে দুজানা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার মাজহারুলের অহংকারের সীমা-পরিসীমা ছিল না। নিজে এমবিবিএস পাস ডাক্তার হওয়ায় সে হাফেজি পড়া আবু দুজানাকে মানুষই মনে করতো না। দলের বৈঠকে সবার সামনেই বলতো—"আবু দুজানা পশ্চিমাদের মতো চতুরভাবে ভাবতে পারে না, কারণ সে শিক্ষাই তার নেই। নেতা হতে হলে পশ্চিমাদের মানহাজও জানতে হবে।" সংগঠনের বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীর মধ্যেও এ কথা সে ছড়িয়েছিল। অথচ দলের সবকিছু যখন শেষ হওয়ার পথে, তখন হারিয়ে

যাওয়া কর্মীদেরকে খুঁজে খুঁজে আবু দুজানা একাই তো জড়ো করেছিল! সেই ২০০১ সাল থেকে সে সংগঠনে রয়েছে। এত সহজে কীভাবে তাকে উড়িয়ে দেয় লোকটা! ২০১৩ সালের বৈঠকে এ লোকই আবার গোপন সংগঠন ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলছিল।

শুরা বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসব ভাবতে ভাবতেই শেল্টারের দিকে রওনা দেয় আবু দুজানা। আপাতত সে থাকছে পঞ্চগড়ে। সেখানে ইদানীং কয়েকটা চা বাগান হয়েছে। একটিতে তার পুরনো পরিচিত এক 'আঁখি' রয়েছে, যে আর সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। কেবল তার ব্যক্তিগত শুভাকাঙ্ক্ষী। তার মাধ্যমেই ওখানে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে আবু দুজানা। এক অফিসের কর্মকর্তাদের খাবার সাপ্লাইয়ের কাজ। তার দ্বিতীয় বিবির ওপর মূলত সে রান্নার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। এতে তার সংসারে রান্নার খরচের চিন্তাটা অন্তত করা লাগে না। প্রতিদিন বিশজনের জন্য রান্না করলে ওখান থেকে নিজের পরিবারের খাবারটুকু ম্যানেজ হয়ে যায় অনায়াসেই।

ডাক্তার মাজহারুলের পরিণতির কথা মনে পড়ে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। কীভাবে তাকে ভাওতা দিয়ে দিনাজপুরের এক নির্জন ধানখেতে নিয়ে, মেরে, সে পুঁতে রেখে এসেছে। সংগঠনের বেশিরভাগ মানুষই এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জেনেছে পুলিশের বয়ানে। তাতে একটা সুবিধা হয়েছে। দলের সবাই ধরে নিয়েছে যে পুলিশই ডাক্তারকে মেরেছে। কেবল ক্ষমতার জন্য তো আবু দুজানা খুন করেনি, শরিয়াভিত্তিক সমাজ গড়তে জিহাদের লক্ষ্যে দলকে এগিয়ে নিতে ডাক্তারকে তার খুন করাটা জরুরি ছিল। ওই ব্যাটা এতদিনে নিশ্চিত নাসারাদের দালাল হয়ে যেত! ডাক্তার উধাও হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আবু দুজানা নিজে কিন্তু দলের নেতৃত্ব নেয়নি। বরং অন্য একজনকে 'দায়িত্বশীল' করে দিয়েছিল। আর ডাক্তারের উধাও হওয়ার দায় সে চাপিয়েছে কারাবন্দি নেতা শায়খ কবিরুলের কাঁধে। কাজেই সংগঠনের ভেতরে ডাক্তারের মাধ্যমে বায়্যাত নেওয়া কেউই তাকে সন্দেহ করার কথা ভাবেওনি। উল্টো তাদের অনেকেই এখন আবু দুজানার ন্যাওটা, খুব কাছের লোক।

দলের মধ্যে নিজের উত্থান এভাবে আস্তে আস্তে ঘটালেও সংগঠনের পুরো কতৃত্ব কখনোই খুব একটা নিরঙ্কুশ ছিল না আবু দুজানার। যেমন ধরা যাক—এখন সে যাদের নিয়ে কাজ করছে, তাদের মধ্যে তারই একচ্ছত্র নেতা হওয়ার কথা। মুখে তাকে দায়িত্বশীল বললেও, অনেক সিদ্ধান্ত একাই